সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলনে মনোজ মিত্রের নাটক

গোলক পতি ধল

গবেষক , বাংলা বিভাগ , বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় , পশ্চিমবঙ্গ

সমাজ সচেতন নাট্যকার মনোজ মিত্র সমকালীন সমস্যামূলক নাটক রচনা করার জন্য বাংলা নাট্যজগতে চিরস্মরনীয় হয়ে রয়েছেন । নাটককে শিল্পরূপে সার্থক করে তোলাই যেকোন শিল্পীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মনোজ মিত্র ও তার ব্যতিক্রম নন । তাঁর নাটকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনি সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের মেলবন্ধন ও স্থান পেয়েছে। সমসাময়িক কালের সাধারণ মানুষের অন্তর- বাহির , আনন্দ- বেদনা,জীবন- সংগ্রাম , শাসন- শোষন ও বাদ- প্রতিবাদের ছবি তাঁর নাটকগুলিতে সমানভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রোমান্সকে অতিক্রম করে মানুষও তাঁদের দুঃখ- দুর্দশাকে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন । শোষিত মানুষের প্রতিবাদী রূপ সম্পর্কে নাট্যকার মনোজ মিত্র ' কৃষ্টি ' পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন – " আমি এইমুহূর্তে একটি বিষয়কেই অধিকার দিয়ে লিখতে চাই , সেটা হল দীন মানুষ , দুর্বল মানুষ , অবহেলিত এবং পর্যুদস্ত মানুষ তার হীনতা , তার দুর্বলতা ,তার ভয় , দ্বিধা , সংশয় কাটিয়ে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে । এদেশের যে কোনও ঘটনার মধ্যেই আমি এই মানুষকে খুঁজি , মানুষের এই সংগ্রামকে ধরতে চাই "।

নাট্যকারকে সর্বদা সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে দায়বদ্ধ থাকতে হয় । কারণ নাটক তার ঊষালগ্ন থেকেই সেচ্ছায় সমাজকে সংশোধন করার দায়িত্ব গ্রহন করেছে । অবশ্য মনোজ মিত্রের সমাজ সম্পর্কে ধারনা অনেকাংশে আলাদা। কারন তার প্রতিটি নাটকের মেজাজ ও ধরন-ধারন সবকিছু আলাদা । কখনও হাসির আড়ালে অশ্রু কখনও বা কবিতা ঘেরা কাব্যময় আবার কখনও বা রহস্য

রোমান্সে উদ্ভাসিত। তবে এই সমস্ত কিছু করতে গিয়ে নিজের চারপাশের সমাজ বাস্তবতাকে তিনি কখনও ভুলতে পারেননি । মনোজ মিত্রের সমাজ চেতনা সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট সমালোচক বলেন -" কোনো শিল্পী ও সাহিত্যিক সমাজের শ্রেনী সমূহের প্রতি সচেতন থেকেও তার সংগ্রামের সীমাকে কোনো নির্দিষ্ট গন্ডীতে বেঁধে রাখতে চান না । কিন্তু তারা মানুষ ও সমাজের ফাঁক-ফোকরগুলো আবিষ্কার করতে চান স্বর্গীয় উপলব্ধিতে , জীবনের রহস্যময় আলোছায়ার বৈচিত্র্যে তাই তাঁদের লেখায় প্রকাশ পায় এক ধরণের সহানুভূতি যা কখনও বা ক্ষমারই নামান্তর। তারাশঙ্কর অথবা বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসে তার উদাহরণ খুব কম নয়। মনোজ মিত্রকেও বোধ করি এই দ্বিতীয় ধারার লেখক বলে গ্রহন করা যায়। " তিনি মনে করতেন সামন্ততান্ত্রিক অপরাধ জগতের নিত্য সঙ্গী হল পুরোহিত সম্প্রদায়। তাই তিনি তাঁর নাটকে – পুরোহিত চরিত্রের অবতারনা করে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর অন্তরের ঘৃনা প্রকাশ করেছেন। 'সাজানো বাগান' নাটকটি তার জ্বলন্ত উদাহরণ স্বরূপ। পুরোহিতের সঙ্গে ন'কড়ির গিন্নীর কথোপকথন ও পুরোহিতের আচরনের মাধ্যমে তার মানসিকতা ও আর্থিক অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন। পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের দ্বারাই বোঝা যায় তার পূজোতে বিন্দুমাত্র মন নেই –" ওঁ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা ... ফট্ স্বাহা ... ফট্ স্বাহা যা বাঞ্চা , ফুটে যা ..." । নকড়ির মঙ্গলকামনার পরিবর্তে নিজের প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর দিকেই পুরোহিতের নজর যে বেশি ছিল তা তার বক্তব্যে সুস্পষ্ট – " দিন ঘুরলে কি আর হোমের দরকার পড়বে মা? (গিন্নির হাত থেকে থলি ও গামছা নিয়ে) একটা শাড়িও দিতে পারলে না! গামছাখানা একেবারে সেলোফিন পেপার ! "

শ্রেনী বিভক্ত সমাজে দ্বন্দ্ব পথ ধরেই প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়, মানুষ অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে । মনোজ মিত্র তাঁর 'চাকভাঙা মধু' (১৯৬০) নাটকে শোষিত শ্রেনীর মানুষের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার ছবিটি চিত্রিত করেছেন। সমাজে মহাজনদের নির্মম-

নিষ্ঠুরতায় সাধারন মানুষদের দুর্দশা যে কী চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে তা তিনি এই নাটকে বাদামীর বক্তব্যের মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন - "(লুব্ধ গলায়) এনেছো কিছু? যোগাড় করিতে পারলে কিছু ? ....পারোনি ? (শূণ্য জালের থলিটা কুড়িয়ে) কিছু পাওনি, না ? আজ তিন দিনের মধ্যি তুমি এট্টা দানাও জোটাতি পারলে না! .... মরুক, কোন্ রাক্কোস এয়েছে প্যাটে – মরুক! "

মনোজ মিত্র সবসময় চেষ্টা করেছেন তার কাজ যেন কখন যান্ত্রিক না হয়ে পড়ে। তাই তিনি তাঁর নাটকে বলার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বলার ধরনের উপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন । তাই বলা হয়েছে – "খোলস বা মোড়ক যারই হোক, স্বরগ্রাম যে রকমই হোক, শেষ পর্যন্ত অত্যাচারের শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের জয় ও প্রতিষ্ঠা, ভন্ডামির বিরুদ্ধে সত্য ও মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা এবং মৃত্যুর বিকল্পে জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখানোর সংকল্প থেকে মনোজ মিত্র বিচ্যুত হন না।"

মনোজ মিত্র তাঁর 'নেকড়ে' (১৯৬৮) নাটকে শাসক শোষিত লড়াইয়ে সরাসরি শোষিতের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জয় ঘোষনা করার চেষ্টা করেছেন । সাধারন মানুষকে বঞ্চিত করে যে শোষক সম্প্রদায় নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত তাদের তিনি কখনও ক্ষমা করতে পারেননি । শোষক সম্প্রদায় যে শুধুমাত্র সাধারন মানুষদের বঞ্চিত করেছে তা নয় নারীদের অসম্মানও করেছে। তাই এক অসহায় নারী প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। নানা কৌশল অবলম্বন করে বুলডগ কুকুরকে বধ করে কংমারিকে নিঃসঙ্গ হতে বাধ্য করেছে। পরে লড়াইয়ে শশাঙ্কের গুলিতে আহত হওয়ার পরেও ঘন্টাবাজিয়ে সকলকে ছুটে আসার ইঙ্গিত দিয়েছে। এই নাটকে নাট্যকার একদিকে যেমন শোষিত সাম্প্রদায়ের প্রতি শাসকের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন ঠিক তেমনি সকলের সংঘবদ্ধতা যে সমস্ত শোষন পীড়ন থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে তাও জানিয়েছেন। তাইতো শেষ পর্যন্ত শোষক সম্প্রদায়ের গলায় জয়োল্লাস ধ্বনিত হয়েছে।

১৯৭২-৭৩ সালে 'অশ্বত্থামা ' নাটকটি তিনি পুনরায় লেখেন । নাটকটি পুরাণ অবলম্বনে রচিত হলেও সমকালীন ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও তাতে স্থান পেয়েছিল। ষাটের দশকের শেষভাগে গড়ে ওঠা আন্দোলনে শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই এই আন্দোলন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল । এই বিভ্রান্ত যৌবনের প্রতীক রূপে নাট্যকার মনোজ মিত্র অশ্বত্থামা চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন । অশ্বত্থামা সারাজীবন আদর্শ অনুগত প্রাণ থাকা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত দুর্যোধনকে রক্ষা করতে পারেনি । তাই জীবনের শেষ মুহূর্তে তার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন স্থান পেয়েছে –" অন্ধ ! শত্রু চিনি না, শত্রুকে আঘাত করতে পারি না । শেষ মুহূর্তে ভুল করি , একটা দৃষ্টিহীন বিশাল খাঁড়া কাঁধে আমি জনারন্যে ঘুরপাক খাই ।" কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজের কর্তব্য ত্যাগ করতে পারেনি। সে শেষ মুহূর্তে বুঝতে পেরেছে দুর্যোধন নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাকে ব্যবহার করেছে মাত্র । কারণ ব্যক্তিগতভাবে পান্ডবদের সঙ্গে তার কোন বিরোধ ছিল না। নিজ কৃতকর্মের জন্য সে অনুতপ্ত। তাই তার মনে হয়েছে অন্ততপক্ষে একবার সব কর্তব্য কর্ম ভুলে নিজ আদর্শকে সর্বোচ্চ স্থান দেবে তাই নতুন প্রান সৃষ্টির প্রতিজ্ঞাও করে । এই নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার মনোজ মিত্র এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে আদর্শের বিনাশ কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয় । প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার 'অশ্বত্থামা' নাটকটির দ্বারা তৎকালীন সময়ে প্রচলিত কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করেছিলেন। সমাজসচেতন শিল্পী মনোজ মিত্র কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রত্যাবর্তনকে স্মরণ করে বলেছেন –" ঘাতক আমরা , রাজার পালিত ঘাতক ... আমাদের সাধ্য কি কৃতবর্মা , মহান ধর্মকে চূর্ন করি , যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে অধর্মের বিনাশে ।"

নাট্যকার মনোজ মিত্র সমকালীন সামাজিক অস্থিরতা , রাজনীতি বিষয়ক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব , নকশাল আন্দোলন চলাকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি এই সমস্ত বিষয়গুলি 'শিবের অসাধ্যি' (১৯৭৪) নাটকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এই নাটকে তিনি জমিদারদের অসুর আর দেবী দুর্গাকে রাষ্ট্র

নায়িকারূপে চিহ্নিত করেছেন। এখানে ‘গরিবি হটাও’ স্লোগানের প্রতি যেমন তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন। তেমনি অন্যদিকে বিদ্যুৎহীন খুঁটি , ভোট নিয়ে জালিয়াতি, শাসক সম্প্রদায় ও পুলিশের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ে সমাজের বাস্তব চিত্রটি সকলের সামনে উপস্থাপিত করেছেন ।

নাট্যকার মনোজ মিত্র বারবার মানুষের উপর বিশ্বাস রাখতে চেয়েছেন । বিশেষ করে মানুষের শুভবুদ্ধির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে কখনও ভাঙতে দেননি । তাই তো ‘মেষ ও রাক্ষস’(১৯৭৯) নাটকে আমরা দেখি হীরামনের মেষের চামড়া আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয় এবং সুবর্ণ ও নীলকমলের সঙ্গ নিয়ে রাক্ষসকে হত্যা করে । কারণ তিনি মনে করেন যতক্ষন না মানুষের শুভবুদ্ধির জাগরণ ঘটবে ততক্ষণ রাক্ষসরূপ শাসনের অবসান ঘটানো কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাঁর মতে যতক্ষন না মানুষ ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বৃহত্তর স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করবে ততক্ষণ কোনো সংগ্রামে জয়লাভ সম্ভব নয় । ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করতে পেরেছিল বলেই হীরামন-সুবর্ণ-নীলকমল রাক্ষসকে বন্দী এবং হত্যা করতে পেরেছিল । মনোজ মিত্রের সমাজ চেতনা লক্ষ্য করে বিশিষ্ট সমালোচক মন্তব্য করেছেন – “ হীরামন, সুবর্ণ ও নীলকমলের মনের দৃঢ়তা, রাক্ষস রাজের অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনা শোষন রোধের শপথে কঙ্কের বলিষ্ঠ প্রেরণা অনেকটাই যুগ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শের বাতাবরণ সৃষ্টি করে।”

মনোজ মিত্রের প্রকৃতপক্ষে কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য ছিল না । তাই তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক নাটক লেখেননি। কিন্তু সমালোচকগণ এই কথা মানতে নারাজ । তাদের মতে কোন রাজনৈতিক তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া ‘মেষ ও রাক্ষস’ – এর মত নাটক লেখা সম্ভব নয়। তবে একথা অস্বীকার করলে চলবে না তিনি রাজনৈতিক টানাপোড়নের মধ্যেও সমাজচেতনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মহাজনদের অত্যাচার , রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, আপাতকালীন অবস্থা এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। সততা ও নিষ্ঠা না থাকলে যে শোষণের অবসান

ঘটানো সম্ভব নয় , এই কথাটি তিনি টের পেয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত নাটকগুলিতে সমষ্টিচেতনা তথা সমাজচেতনাই বিশেষ ভাবে স্থান পেয়েছে। তিনি বরাবর সমাজ তথা মানবজীবনের বাস্তব সত্যি গুলোকে দর্শক সমাজের কাছে উপস্থাপিত করেছেন । তিনি একদিকে যেমন সাধারন , গরীব , অসহায় মানুষদের প্রতি জোতদার- মহাজনদের অত্যাচারের কথা বলেছেন অন্যদিকে তেমনি সেই অত্যাচার থেকে মুক্তির পথও দেখিয়েছেন। অসহায় মানুষদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল বলেই শোষিত শ্রেনীর পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জয়লাভের পথকেও সুনিশ্চিত করতে পেয়েছিলেন।

১৯৮১ সালে তখন বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকাল প্রায় চারবছর অতিক্রান্ত কিন্তু তা সত্ত্বেও শাসনব্যবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়নি। স্বজন পোষন , রাজত্ব রক্ষা , বিবেকবোধ শূণ্যতা , স্বার্থরক্ষা এইসবকিছু দেখে তিনি নিরাশ হয়েছেন । তাই তার মনে হয়েছে শাসকশ্রেনীর পরিবর্তন ঘটলেও শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন বোধ হয় সম্ভব নয় । ১৯৮১ সালে রচিত “রাজদর্শন ” নাটকে এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত। তিনি তাঁর সমস্ত জীবনের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর নাটকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিজের মতাদর্শের কারনেই স্বাভাবিকভাবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন । তাঁর মতাদর্শ সম্পর্কে বিখ্যাত সমালোচক রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন –“ মনোজ মিত্র কখনোই কমিউনিস্ট পার্টি বা গণনাট্যের আওতায় ছিলেন না কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে জমিদার ও জোতদার সম্পর্কে , মহাজনিপ্রথা সম্পর্কে গণনাট্যের বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব এবং তার অনুসরণে রচিত গণনাট্যগুলির সঙ্গে মনোজ মিত্রের ‘চাকভাঙা মধু’, ‘শিবের অসাধ্যি’, ‘সাজানো বাগান’ ‘অথবা ‘নৈশভোজে ’-র খুব একটা পার্থক্য নেই। ”

১৯৮১ সালে “ রাজদর্শন ” নাটক লেখার পর থেকে তার মধ্যে একটি পরিবর্তন আসতে শুরু করে। আর ১৯৮৮ সালে ‘ অলকানন্দার পুত্রকন্যা’ তে তাঁর রাজনীতি- সমাজনীতি ভাবধারায় বিশাল রদবদল পরিলক্ষিত হয় । তাঁর ধারনা প্রবল হয় যে একমাত্র মানুষই পারে সমাজের অবক্ষয়ের বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি চিরকাল ধরে চলে

আসছে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন। তাই সমাজ সচেতন শিল্পী অলকানন্দার মায়ের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ।অলকানন্দা এবং মাদার সৌরজগৎ তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক মন্তব্য করেছেন –" সাহিত্য ক্ষেত্রে গোর্কির মা এক অনন্যসাধারন চরিত্র। কিন্তু তাঁর প্রেক্ষাপটে ছিল শ্রমিক আন্দোলন, তাঁর কাজে ছিল গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য। আর বাস্তব ক্ষেত্রে এই পশ্চিমবাংলায় আমাদের মধ্যে রয়েছেন মাদার টেরিজা। ... তাঁর আছে প্রাতিষ্ঠানিক জোর। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগেও সেই মহৎ মাতৃত্বের প্রসাদ অকাতরে বিতরণ কি একেবারেই অসম্ভব?"

নাট্যকার মনোজ মিত্র ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মাধ্যমে সমাজের মধ্যসত্ত্বভোগী মানুষের ভন্ডামিকে সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর নাটকের ইতিহাস অথবা পুরাণ যাই হোক না কেন , তিনি তার রচনা নৈপুণ্যে তাতে আলাদা মাত্রা সংযোজিত করতে পারতেন। তাই তাঁর লেখা প্রতিটি নাটক স্বতন্ত্র। মনোজ মিত্র একই বক্তব্য নানা খোলসে-বাস্তবে , রূপকে-পুরাণে , কল্পিত ইতিহাসে এবং নানা মেজাজে-গাম্ভীর্যে, ব্যঙ্গে , কৌতুকে, অশ্রুসিক্ত হাস্যে প্রকাশ করতে গিয়ে যেন নিজেকে বারবার উত্তীর্ণ হওয়া এবং নিজের সামনে প্রতি মুহূর্তে একটা চ্যালেঞ্জ খাড়া করেন –" দেখি কথাটা অন্যরকম করে বলা যায় কিনা। আগের মতো করে বলব না, নিজের পুনরাবৃত্তি করব না, অনুকরণ করব না।"

সমাজে অবহেলিত , শোষিত মানুষদের প্রতি তার সহমর্মিতা লক্ষণীয়। মহাজনদের অকথ্য অত্যাচার যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে তখন নিচুতলার শোষিত মানুষরা ক্রোধী হয়ে শোষক শ্রেনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। আর শোষিত মানুষরা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে নামে তখন শোষক শ্রেনী পলায়ণ করতে বাধ্য হয় । 'চাকভাঙা মধু'(১৯৬৯) নাটকে বাদামীর হঠাৎ জাগরণ সেই বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলে। বাদামী সহ সমস্ত গ্রামের মানুষের একতাই অঘোর ঘোষের মত অত্যাচারী জমিদারকে শেষ করতে সক্ষম হবে। শ্রেনী সংগ্রামের এহেন চিত্র দর্শন করে শ্রেষ্ঠ

বাঙালি নাট্যকার উৎপল দত্ত মন্তব্য করেছেন –" শোষকের বিরুদ্ধে ঘৃনা এইভাবেই সৃষ্টি করতে হয় নাটকের মাধ্যমে।"

মনোজ মিত্র আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। সমাজে উঁচু তলার মানুষদের ভন্ডামি,শঠতা, কূটনীতি সবকিছুর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন । তার উপর প্রশাসনের নিস্ক্রিয়তা , বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা , তদন্তের পক্ষপাতিত্ব এই সমস্ত কিছু তিনি ব্যঙ্গের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন । যে আধুনিকতা মানুষের চরিত্র কালিমা লিপ্ত করে, মানুষকে ভুল পথে চালিত করে সেই আধুনিকতাই তাঁর বিন্দু মাত্র আস্থা ছিল না, তাই 'কিনু কাহারের থেটার' (১৯৮৮) ও 'পুঁটি রামায়ন'(১৯৮৯-৯০) নাটকদুটিতে তৎকালীন সমাজের সম্পূর্ন চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। যেখানে দেখানো হয়েছে শিক্ষক থেকে শুরু করে মন্ত্রী সমস্ত মানুষই যে যার নিজের স্বার্থসিদ্ধি নিয়ে সদাই ব্যস্ত। যাদের অন্য কারোর কথাচিন্তা করার সময় পর্যন্ত নেই । মানুষের মূল্যবোধের এই অবক্ষয়ে নাট্যকার ব্যথিত হয়েছেন। ১৯৯০ সালে 'শোভাযাত্রা' নাটকে দেখিয়েছেন অসহায় , বিপন্ন মানুষদের যারা চিরকাল ধরে অত্যাচারিত কিন্তু সঠিক বিচার কখনও পায়নি । বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার এই প্রসঙ্গে বলেছেন – " জমিদার অথবা জোতদার বাংলা নাটকে ভিলেন হয় , তাদের আক্রমন করে অনেক নাটক প্রযোজিত হয়েছে , শেষ দৃশ্যে লাল মশাল জ্বালিয়ে , কিন্তু সেই জমিদার পরিবারের শেষ নিঃস্ব বংশধরকে সম্পূর্ণ অন্য ভূমিকায় এনে এই প্রথম এক অদ্ভূত পরিস্থিতি তৈরী করলেন মনোজ মিত্র।" 'গল্পহেকিম সাহেব '(১৯৯২-৯৩) নাটকটির মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চলাকালীন সমাজের আর্থিক প্রেক্ষাপটটি নাট্যকার তুলে ধরেছেন । ভগীরথ মিশ্রের ভাষায় ' চিকিৎসা ' হল 'সুবিদ্যা' যা সুগন্ধী ফুলের মত । কিন্তু শোষক শ্রেনী তা মানতে নারাজ । তাইতো চিকিৎসকের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধে। তাই হেকিম চেষ্টা করেছিল রোগ হওয়ার পর তার চিকিৎসা করার চেয়ে রোগ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে । তাই হেকিম সাধারন মানুষদের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টির প্রয়াস করেছিল তাই

তাকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। কারণ চিরকাল এই ধারনাটি সকলের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে – "শাসক ও মধ্যসত্বভোগী সম্প্রদায় চিরকালই শোষক চরিত্র বহন করে, জনগন সচেতন হোক এটা তাদের কখনই কাম্য নয়। যিনি সেই সচেতন করায় উদ্যোগী হবেন তার কপালে কোপ পড়বে।"

২০০০ সালে মনোজ মিত্র তাঁর 'নাকছাবিটা' নাটকে পঞ্চাশ বছর আগের সমাজের চিত্র পাঠক সমাজের কাছে পরিস্ফুট করেছেন । স্বাধীনতার ঠিক অব্যবহিত পরে যখন সমস্ত মানুষ নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। সেই সময়ই বীরেশ্বরের মত এক বিপ্লবী চরিত্র যে নিজের আদর্শ রক্ষায় জেলে যেতেও দ্বিধাবোধ করেনি। যে যুগে মানুষ পুরনো সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে সামনের সারিতে এগিয়ে যেতে ব্যস্ত , সেই সময় বীরেশ্বরের মত চরিত্র সৃষ্টি যথার্থই নাট্যকারের কলা নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। যে পুরনো ধ্যান-ধারনা আঁকড়ে বাঁচতে চায়, তাই ইংরেজ সরকারের বিরোধীতা করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই বীরেশ্বর নামক চরিত্রটির মাধ্যমে তাঁর পজিটিভ চিন্তাভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন ।

মানুষ ক্রমশ স্বার্থান্বেষী ও সুযোগ সন্ধানী হয়ে পড়েছে। আর বর্তমানকালের শাসন ব্যবস্থায় খুব সহজেই মানুষ হাতের কাছে সবকিছু পেয়ে যাচ্ছে তাই তারা লোভী হয়ে পড়েছে । এই ধরনের রাজনৈতিক শঠতা ও দুনীর্তির বিপরীতে দাঁড়িয়ে মনোজ মিত্র লড়াই করেছেন । মানুষ কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে । ফলে পেতে পেতে মানুষ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যখন একটুতেই হতাশ হয়ে পড়ছে । কিন্তু যাঁরা Sensitive মানুষ তারা ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোন পথে গেলে এই দুর্দশার মুক্তি ঘটবে তার জন্য কোন আশার আলো দেখতে পাননি ।

সমাজসচেতন শিল্পী মনোজ মিত্র তাঁর নাটকগুলিতে শুধুমাত্র সমাজ বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন তা নয় , সেই সঙ্গে বর্তমান সমাজ কিভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে তার পথও নির্দেশ

করেছেন। তিনি শৈশবে থেকে নিজের চারপাশে যা কিছু দেখেছেন তাই তার নাটকে তুলে ধরেছেন । তাই তার নাটকে মানুষের সঙ্গে পশুপাখি, দেব-দেবীও স্থান লাভ করেছে। মনোজ মিত্র মানব জীবনের বাস্তব সত্যগুলোকে শৈল্পিক ভঙ্গিমায় তার নাটকে উপস্থাপিত করেছেন। শাসক শ্রেনীর অত্যাচার , শোষণ উপেক্ষা করে শোষিত সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং সবশেষে শোষিত সম্প্রদায়ের জয় ঘোষনা করেছেন। তিনি তাঁর নাটকগুলিতে সমাজের রুঢ় বাস্তবতা সত্ত্বেও সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

মনোজ মিত্র নগর জীবনে অভ্যস্ত হলেও শৈশবের একান্নবর্তী পরিবার গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ সব সময় তাঁর মনের গভীরে যে বাসা বেঁধেছিল তার প্রমান তাঁর নাটক গুলি। বর্তমান কালে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয় তাঁকে প্রতিনিয়ত ব্যথিত করেছে। শোষক-শোষিতের লড়াইয়ে সর্বদা তিনি শোষিত সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন । আবার তিনি কখনও প্রতিবাদী কখনও ক্রোধী কখনও রূপকের আড়ালে তাঁর নাটকগুলিতে সাধারণ মানুষের জয় ঘোষনা করেছেন । তিনি কখনোই কোনো রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলেও যখন প্রয়োজন হয়েছে তখনই প্রতিবাদী সুরে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি নাট্যকার , অভিনেতা ও নাট্যনির্দেশক ছিলেন। তাই তাঁর নাটকগুলি শিল্প হিসেবে সার্থকতা লাভ করেছে। তাছাড়া চরিত্র-চিত্রন, রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক ব্যবহার , সংলাপের ব্যবহার , গানের ব্যবহার সব দিক থেকে তিনি নিপুণতার পরিচয় রেখেছেন। যে সমস্ত বিষয় মানুষের মন স্পর্শ করবে এবং যে সমস্ত বিষয় দেশের মানুষের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে বারবার সেই সমস্ত বিষয়কেই তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু রূপে নির্বাচন করেছেন । তিনি কখনোই কোনো বিষয়কেই আকস্মিকভাবে উপস্থাপন করেননি বরং নাট্যশর্ত রক্ষা করে বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার চেষ্টা করেছেন। কখনও বিদ্রুপ করে আবার কখনও বা ক্রোধের মাধ্যমে পাঠক সমাজকে উদ্দীপিত করেছেন তিনি। অসহায় দরিদ্র প্রান্তিক মানুষদের চিরকালীন লড়াইকে শিল্প

রূপের আধারে প্রকাশ করাই তাঁর নাটক রচনার আসল উদ্দেশ্য ছিল আর সেই কাজে তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তথ্যসূত্র

সহায়কগ্রন্থ

১। সময়ের অমেয় আঁধারে মনোজ মিত্র - বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ - ৬/২- রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট – কলকাতা– ০৯, প্রথম প্রকাশ - ২২ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ ৩৭

২। ***The elements of drama- Theodore Hatlen- orientation of thetheatre, p 31***

৩। বাঞ্ছারাম থিয়েটারে সিনেমায় - মনোজ মিত্র - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্সপ্রঃলিঃ -১০, শ্যামাচরণ দে ট্রিট, কলিকাতা–৭৩, প্রথম প্রকাশ - মাঘ ১৪০৬, পৃ ২০

৪। ঐ , পৃ ২১

৫। মুন্নি ও সাত চৌকিদার' - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র কার্তিক ১৪১০, - চতুর্থ খন্ড- মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রঃলিঃ পৃ ১৮৫

৬। গল্প হেকিম সাহেব - রূপকের আয়নায় মনোজ মিত্র শম্পা মিত্র - রত্নাবলী - কেশবচন্দ্র ট্রিস্ট,কলকাতা–০৯, প্রথম প্রকাশ - ফাগুন১৪১৪, বই মেলা ২০০৮, পৃ ৫০

৭। সময়ের অমেয় আঁধারে মনোজ মিত্র - বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ - রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট - কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ২২ ডিসেম্বর–২০১৯, পৃ ২৮৮

৮। মিত্র মনোজ ও অমর মিত্র – ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে – দে'জ পাবলিশিং – কোলকাতা – ৭৩,জানুয়ারী ২০১১

১০। সময়ের অমেয় আঁধারে মনোজ মিত্র - বঙ্গীয়সাহিত্য সংসদ–৬/২রমানথ মজুমদার স্ট্রিট - কলকাতা–০৯, প্রথম প্রকাশ২২ ডিসেম্বর২০১৯, পৃ ১২৯

১১। সময়ের অমেয় আঁধারে মনোজ মিত্র - বঙ্গীয়সাহিত্য সংসদ -৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট- কলকাতা–০৯ প্রথম প্রকাশ ২২ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ ১২৫-১২৭

১২। চেতনা নাট্য উৎসব- মনোজ মিত্র সাক্ষাৎকার,১৯৭৬

১৩। কমেডির উদ্ভব- অ্যারিস্টটল পোয়েটিকস- অনু শিশির কুমার দাস–প্যাপিরাস গনেন্দ্র মিত্র লেন- কলকাতা–০৪, আগস্ট ১৯৮৬

১৪। গল্প হেকিম সাহেব – *শম্পা মিত্র*- রূপকের আয়নায় – রত্নাবলী – কোলকাতা – ০৯ ফাল্গুন ১৪১৪

১৫। সময়ের অমেয় আঁধারে - মনোজ মিত্র – মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় - বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ – কোলকাতা – ০৯,

আকর গ্রন্থ

১। মিত্র মনোজ – নাটক সমগ্র – মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্র : লি : - কোলকাতা -৭৩

২। অ্যারিস্টটল – কাব্যতত্ত্ব – অনু , শিশিরকুমার দাস – প্যাপিরাস – কোলকাতা – ০৪, ডিসেম্বর ১৯৯৪

৩। বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ – (শম্পা) – ‘ শিবের অসাধ্যি ‘ , ‘ নৈশভোজ ‘ , ‘ পুঁটি রামায়ণ ‘ সংকলন অপেরা – কোলকাতা ০৯ , শ্রাবণ ১৪১২

৪। বন্দ্যোপাধ্যায় সত্য – বের্টোল্ট ব্রেখট ও আধুনিক থিয়েটার – পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাদেমি – কোল – ২০, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

৫। মিত্র মনোজ – বাঞ্ছারাম : থিয়েটারের সিনেমায় – মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্র : লি : - কোলকাতা -৭৩, মাঘ ১৪০৬

৬। মুখোপাধ্যায় অশোক – প্রসঙ্গ অভিনয় অপেরা – কোল – ০৯, আশ্বিন ১৪০৪

৭। সরকার পবিত্র – নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ – প্রমা প্রকাশনী কোলকাতা , বৈশাখ ১৩৯৭

২২ ডিসেম্বর ২০১৯

৮। মিত্র মনোজ - পুঁটি রামায়ণ- মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথমখন্ড, পৃ ৩১০

৯। মিত্র মনোজ - দম্পতি - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - তৃতীয় খন্ড - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রঃলিঃ- ১০, শ্যামাচরণ দে ট্রিট- কলকাতা ৭৩, মাঘ ১৪০২, পৃ ২০১

১০। পুঁটি রামায়ণ- মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্র নাটক সমগ্র - প্রথমখন্ড, পৃ ৩১০

১১। চোখে আঙুল দাদা- মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্রনাটকসমগ্র - দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৩৮২

১২। পাখি- মনোজ মিত্র - মনোজ মিত্রের নাটক সমগ্র - প্রথম খন্ড , পৃষ্ঠা ৪৩০